গল্প নয়

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

আমি এ গল্পটি শুনি যেভাবে তাও বলি।

গাড়িতে বড় ভিড়, ইন্টার ক্লাসও নেই, সেকেন্ড ক্লাসও নেই। অতি কষ্টে একখানা গাড়িতে ভীষণ ভিড়ের মধ্যেঠেলেঠুলে কোনোরকমে উঠলাম। উঠে ঠিক বোঝা গেল নাগাড়ির মধ্যে কোথাও জায়গা আছে কি নেই। এক জায়গায়কায়ক্লেশে একটু স্থান করে নিয়ে কোনোরকমে নিজেকেগুঁজলাম দুজন মানুষের মাঝখানে। আমার বাঁ-ধারে যেলোকটা বসে ছিল, তাকে অন্ধকারের মধ্যে দেখে মনে হলগরিব উড়িয়া, কারণ আসছিলাম কটক থেকে। একটু অবজ্ঞারসুরে বললাম—কোথায় যাউছন্তি ?

আমার উড়িয়া ভাষার জ্ঞান বার-দুই পুরী আসবারঅভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এটা এখানে বলা আবশ্যক। যে লোকটির গায়ে হাত দিয়ে কথা বললাম, সে বিরক্তিরসুরে পরিষ্কার বাংলায় বললে—এ রকম বলাটা এটিকেট নয়মশায়—

আমি অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। বাঙালি ভদ্রলোক জানলেকখনই আমি এ রকম বলতে সাহস করতাম না। হাতজোড়করে বললাম-মাপ করবেন মশাই। আমি বুঝতে পারিনি—

—না না কিছু না। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

ক্রমে খুব আলাপ জমে গেল ওঁর সঙ্গে। নাম বললেন জগবন্ধু চক্রবর্তী, বাড়ি বর্ধমান জেলায়। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু এখনো বেশ শক্ত-সমর্থ। সাধু সন্ন্যাসী ধরনেরলোক। তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে বেড়ানোই কাজ। আগে রেলে কাজ করতেন। গত পনেরো বিশ বছর ধরে তীর্থ ভ্রমণ ছাড়াকোনো বৈষয়িক কর্মে মন দেয় নি।

রাত তখন ন'টা। এই সময় থেকে রাত তিনটের সময়খড়্গপুর আসা পর্যন্ত দীর্ঘ পথে আমরা দুজনে শুধু গল্পগুজবকরেছি। আমি বেশি গল্প করি নি, বেশির ভাগ গল্প করেচেনতিনি।

একটা অসাধারণ ধরনের গল্প এখানে করি। শুনে সত্যিইঅবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর কথাতেই বলি—

—সংসারটা অসার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তীর্থে তীর্থেবেড়াতে লাগলাম। বুঝলেন না ?কিছু ভালো লাগে না।

—আপনার স্ত্রী ?

—স্ত্রী থাকে বাড়িতে।

—দেখাশুনো করে কে ?ছেলেরা ?

—ছেলে নেই। তিনটি মেয়ে। বিয়ে-থাওয়া হয়ে গিয়েচে, শ্বশুরবাড়ি ঘরকন্না করচে। কাজেই আমার কোনোপিছুটান নেই মশায়। কেন বেড়াবো না ?নানারকম অভিজ্ঞতাহয়েচে দেশবিদেশে বেড়িয়ে। একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়েচে কিজানেন, ভগবানের নামের অনেক গুণ। বড় মজা।

—কি রকম ?

—সেবার চৈত্র মাসেই বড় গরম পড়ে গেল। কাটোয়া স্টেশনে নেমে দু-ক্রোশ তফাতে অজয় নদের বাঁধ, বেশ চওড়া, দুধারে কাশবন। সেই বাঁধ বেয়ে আরো ক্রোশ-দুইগেলে তিলজুড়ি গাঁয়ে আমার এক শিষ্যের বাড়ি সেখানেই যাচ্ছি। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নির্জন স্থান, মানুষজননেই কোনোদিকে—নিকটবর্তী গ্রামও দু-ক্রোশ দূর। এমন সময়মশায়, দেখি যে চারজন ষণ্ডামার্কা জোয়ান লোক বাঁ-দিকেরকাশবন ঠেলে বাঁধের উপর এসে উঠলো। হাতে তাদের মোটামোটা বাঁশের লাঠি—আমার দিকে এগিয়ে এসে সামনেরলোকটা দুহাতে লাঠি তুললে আমার মাথা লক্ষ্য করে। মাথায়লাঠি মারে মারে—আর বেশি দেরি নেই ! ভবলীলা সাঙ্গ হল, হল কি, হয়ে গিয়েছে—এমন সময় আমার মনে কে যেনকি বলে দিলে, আমি লোকটির দিকে চেয়ে বললাম বাপু হে, হরিনাম করো। হরিবোল বলো। কেন আমাকে খুন করেব্রহ্মহত্যার পাতক ঘাড়ে নেবে ?টাকা চাও, এই নাও ব্যাগ।সামান্য যা কিছু আছে, ব্যাগে আছে। মানুষ খুন করবে কেন ?পাপ কেন করবে ?হরিবোল বলো। হরিবোল বলো—

আমি বললাম—আপনি যখন বলেছিলেন একথা, আপনার মনের ভাব কি রকম হচ্ছিল?

—মনে ভয়ও ছিল না, ভরসাও ছিল না। অসাড় হয়ে গিয়েছিল মন। মরে যাই, যাবো। এই রকম মনের ভাব। কেযেন কি বলচে মনের মধ্যে বসে। কি আশ্চর্যভাব—কে যেনবলচে—ওকে বলো, ওকে বলো ! কি বলবো ?যা মুখ দিয়েবেরুবে।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম—তারপর ?

—তারপর যা আশা করি নি, তাই ঘটে গেল হঠাৎ।লোকটি লাঠি নামিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।বললে—আপনার নাম কি ?আমি নাম বললাম। সে আরো এগিয়ে বললে—দিন ব্যাগটা আমার হাতে। আমি ওর হাতেব্যাগটা তুলে দিয়ে ভাবলাম টাকাগুলো নিয়ে লোকটা আমায়ছেড়ে দিলে বুঝি। কিন্তু তারপর দেখি লোকটা আমার পিছুপিছু আসচে। তিলজুড়ি গ্রামের কাছে এসে পৌঁছেচি, ঘরবাড়িদেখা যাচ্চে, তখন সে বললে—ঠাকুর, আপনার ব্যাগটা ধরুন।কথার সুরে মুর্শিদাবাদের টান। পেছনে চেয়ে দেখি বাকি তিনটিলোক নেই, কখন সরে পড়েচে লক্ষ্য করি নি। তারপর সে ট্যাক থেকে একটা টাকা বার করে নীচু হয়ে আমার পায়েরওপর রেখে উপুড় হয়ে প্রণাম করলে। বললে, পায়ের ধুলো নেবার যুগ্যি নই, আমি জাতে বাগদী। আমার বাড়ি ডহ্‌রাপাড়া, কাটোয়া ইস্টিশান থেকে সাত ক্রোশ পশ্চিমে। আমার নামসতীশ বাগদী। আপনাকে একটা কথা দিতে হবে ঠাকুর, বলুনযে আমার বাড়ি একদিন পায়ের ধুলো দেবেন ?আমি অতি নীচজাত। তবু নীচকেও তো উদ্ধার করতে হবে ?নীচ জাত যাবেকোথায়?বলুন, কির্‌পা করবেন তো ?

আমি বললাম—যাবো। আজ যাও। আর হরিমন্ত্রেতোমায় দীক্ষা দিলাম। ওটি ভুলো না।

সে চলে গেল। যখন যাচ্চে তখন আমি স্পষ্ট শুনলাম সে হরিনাম করতে করতে গেল। আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আমি স্বকর্ণে শুনেচি।

আর একটা কি হল জানেন, যখন ও চলে যাচ্চে তখনআমার মনে সে কি অপূর্ব ভাব ! আমি ওর দিকে চেয়ে আছি, ওক্রমে দূরে সরে যাচ্চে, আমার মনে যেন কে বলচে—আহা, কষ্ট পাচ্ছিল, উদ্ধার হয়ে গেল উদ্ধার হয়ে গেল। ভগবানের নাম মহাপুণ্য। সেই পুণ্য আজ ওর হল। বেঁচে গেল লোকটা, বেঁচে গেল। কে দয়া করে এই ঘটনাটির যোগাযোগ ঘটালে কি জানি। এই সন্ধ্যাবেলা আমাকে উপলক্ষ্য করে কে যেন এই পাপীতাপীকে হরিনাম বিলিয়ে উদ্ধার করে গেল।

এইবার আমার পালা।

বললাম—সতীশ বাগদীর বাড়ি গিয়েছিলেন ?

—শুনুন বলি। সেই শ্রাবণ মাসে অবসর পেয়ে ভাবলাম ডহরাপাড়া গ্রামে যাবো। কাটোয়ার বাজারে একটা দোকানেবসে ওই গ্রামের নাম বলতে একজন বললে—সে গ্রামে কোথায় যাবেন ?

আমি বললাম, সতীশ বাগদীর বাড়ি।

সে লোকটা বললে—লেঠেল সতীশ বাগদী ?

—তা হবে।

—তাকে আপনি চিনতেন ?

—একবার আলাপ হয়েছিল।

—সতীশ নেই। মাস দুই হল কলেরায় মারা গিয়েচে।

মনে মনে সতীশের আত্মার মঙ্গলকামনা করে কাটোয়া স্টেশনে ট্রেনে চড়লাম।